মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, মে ২০২৬

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

২০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আহমেদ আযম খান, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন এবং সচিব মো: আশরাফুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী ও মফিদুল হক এবং ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন তাদের জাদুঘর ঘুরে দেখান। মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। এসময়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের নির্ভুল ইতিহাস তুলে ধরতে জাদুঘরের গুরুত্ব রয়েছে। জাদুঘরের বিদ্যমান সংগ্রহ ও উপস্থাপনা জাতির গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে তিনি মন্তব্য করেন, পাশাপাশি তিনি জাদুঘরের প্রদর্শনীকে আরো সমৃদ্ধ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন : ৭ এপ্রিল ২০২৬

“সাধ্য কি ৮ জন মানুষ এমন বিপুল কর্মযজ্ঞকে সর্বজনের সামনে তুলে ধরেন! এই ৩০টি বছরের যাত্রাপথে অগণিত মানুষ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই শুধু সেগুনবাগিচায় নয়, ২০১৭ সালে এই অট্টালিকায় জাদুঘর স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ যেমন ছিল বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ সর্বজনের অংশগ্রহণে এক জনযুদ্ধ, ঠিক তেমনি এ জাদুঘর তিলে তিলে গড়ে উঠেছে আপনাদের সর্বজনের সহযোগিতায়। আপনাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আপনারা সকলে আমাদের ধন্যবাদ জানবেন।” ২২ মার্চ ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ৭ এপ্রিল আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর এমন স্মৃতিচারনমূলক সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বিগত ১৮ মাসের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ব্যক্তির ভূমিকা, সামরিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে। মতপার্থক্য আছে সেই সময়ের দুই পরাশক্তি বিভক্ত বিশ্বের ভূমিকা নিয়ে। তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব বর্ণনা মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন– এটি দোষের কিছু নয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইতিহাসের বর্ণনা তুলে ধরে তার প্রদর্শনী সামগ্রীর মধ্য দিয়ে, বিশ্লেষণ সে করে না। এটি দর্শকের দায়।

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ড. শাহদীন মালিক

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মারক বক্তৃতা

১৯৭২-এর সংবিধান: আদর্শ, পরবর্তী বাস্তবতা ও সমকালীন আলোচনা

ড. শাহদীন মালিক

ইতিহাস বিতর্কের বড় যায়গা। E. H. Carr গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ৬টি বক্তব্য দিয়েছিলেন। বইয়ের নাম ছিল ‘What is History?’

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬

মফিদুল হক
ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ সেগুন বাগিচার সাবেকী দ্বিতল ভবনে যাত্রাশুরুর পর তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে বহু মানুষের বহু ধরনের অবদানে জাদুঘর পুষ্ট হয়েছে। অগণিতজন নানাভাবে জাদুঘরের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও তা প্রসারে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তিরিশ বছরের পথচলায় দুটি অর্জনের কথা আজ আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সর্ববৃহৎ তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এই জাদুঘরে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জনমানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক দানে গড়ে উঠেছে বিশাল তথ্যভাণ্ডার, যা আমাদের সুপরিসর চারটি গ্যালারিতে উপস্থাপিত প্রদর্শনীকে যেমন তথ্যমূলক, ঐতিহাসিক ও শিক্ষামূলক করেছে, তেমনি অনেক চিত্ত-আলোড়নকারী স্মারক দ্বারা তা করে তুলেছে গভীরভাবে মানবিক। একই সাথে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিসরেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশিষ্ট স্থান করে নিতে পেরেছে। এর প্রতিফল হিসেবে আমরা দেখেছি বিগত তিন দশকে বিভিন্ন সরকারের দিক থেকেও এর স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। একাদিক্রমে বিভিন্ন সরকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে বার্ষিক অনুদান প্রদান অব্যাহত রেখেছে। জনগণের সহায়তা ও সরকারি অনুদানের সম্মিলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যয় নির্বাহ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে। এরই প্রতিফলন ঘটেছে আগারগাঁওয়ে প্রায় এক একর জমির বরাদ্দ লাভ ও সুপরিসর স্থায়ী জাদুঘর নির্মাণে। তবে বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে এই সম্পর্কে যে ব্যত্যয় ঘটেছে তা' এখানে উল্লেখ করা দরকার। জুলাই অভ্যুত্থানের পর গঠিত নতুন সরকারের দিক থেকে চলমান অর্থ বরাদ্দ অব্যাহত ছিল। নভেম্বর ২০২৫-এ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক-ই আজম জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং এর প্রদর্শনী ও কর্মকান্ডের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন। তবে অল্প কিছুকাল পর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটে, ৯ জানুয়ারি ২০২৬ জাদুঘরের প্রদর্শনী পক্ষপাতদুষ্ট এমন অভিযোগ এনে তারা একটি কমিটি গঠন করে এবং জাদুঘরের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছাড় করা স্থগিত রাখে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্পর্কে নানা দিক থেকে নানা পরামর্শ আমরা কামনা করি এবং একে স্বাগত জানাই। ইতিহাসের তথ্যমূলক বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনা আমাদের উদ্দীষ্ট। তবে কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকারে আমরা প্রস্তুত নই, আর তাই আমরা মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির সঙ্গে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করি, একই সাথে অনুদানের অর্থ ছাড়ের জন্য তাদের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জনগণ ও সরকারের সহায়তায় আপন স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা বজায় রেখে পরিচালিত হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। অন্তর্বর্তী সরকারের দিক থেকে গৃহীত পদক্ষেপ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্বতা রক্ষার দিকে আমাদের আরো মনোযোগী করে তুলে এবং আত্মশক্তিতে চলবার ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করি। এই সময়ে যাঁরা বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্তিম সময়ে বিগত মধ্য জানুয়ারি ২০২৬ এক পত্রযোগে মন্ত্রণালয় বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় দিতে সম্মতি ব্যক্ত করে। নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমরা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করেছি এবং বরাদ্দের অর্থ গ্রহণ সূচনা করেছি। তবে বিগত সময়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ট্রাস্টি বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সরকারি তহবিলে দেয় অর্থ (বিদ্যুৎ,গ্যাস, পানি, পৌরকর ইত্যাদি), নিরাপত্তা রক্ষী যোগান ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় ছাড়া অন্য খাতে অর্থ আমরা গ্রহণ করবো না। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিজস্ব শক্তিতে জনগণের সহায়তায় স্বীয় পরিচালন ব্যয়-নির্বাহ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

দুঃসময়ে আমাদের পথচলা সম্ভব হওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বকীয়তা নিয়ে চলবার আস্থা আমরা পেয়েছি। তবে এজন্য আমাদের নিজস্ব স্থায়ী তহবিল আরো পুষ্ট করতে হবে। আমরা ভবন নির্মাণকালে অর্থ সংগ্রহে যে বিপুল সাড়া সমাজের পক্ষ থেকে পেয়েছিলাম, সেই প্রেরণা নিয়ে আগামীতে স্থায়ী তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু করার পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি।

বিভিন্ন উৎস থেকে নানা স্মারক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জমা হচ্ছে। দালিলিক স্মারকসমূহের ডিজিটালাইজেশনের কাজ এগিয়ে চলছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষকদের জন্য জাদুঘরের তথ্য ভাণ্ডার নানাভাবে সহায়ক হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে গবেষক ও অনুসন্ধানী ব্যক্তিদের অধিকতর সম্পৃক্ততা আমরা কামনা করি। ৫৫,০০০-এর বেশি প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জমা রয়েছে, ভারতে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধার তথ্য ফর্ম রয়েছে ষাট হাজারেরও বেশি, রয়েছে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন বিদেশি আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত নানা দলিলপত্র। জাদুঘরের আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারে তরুণ প্রজন্মের গবেষক ও শিক্ষার্থীরা আরো আগ্রহী হবেন, সেটা আমাদের প্রত্যাশা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যাণ্ড জাস্টিস এবং ফিল্ম সেন্টার তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সেন্টারের বার্ষিক আবাসিক উইন্টার স্কুল এবার কিছুটা বিলম্বে আয়োজিত হবে এপ্রিলের ২৪ থেকে ৩০ পর্যন্ত। পরিকল্পিত লিবারেশন ডকফেস্ট আগামী জুন মাসে আয়োজিত হবে। তরুণ প্রজন্মের গবেষক ও স্বেচ্ছাকর্মীদের নিয়ে এইসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

যে মুক্তির আকুতি নিয়ে এ-দেশের মানুষ জনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই স্পৃহা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত ও বহমান রাখা আমাদের সবার কর্তব্য। মুক্তির চেতনা বাংলার ইতিহাসে নানাভাবে স্ফুরিত হয়েছে এবং এর বড় প্রতীক সমাজমুক্তি ও নারী জাগরণের রূপকার রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ইউনেস্কোর প্রত্যাশা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'সুলতানার স্বপ্ন' ঘিরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল যা বিগত বছর আরো প্রসারতা অর্জন করেছে। ৪০টি বেসরকারি গ্রন্থাগার ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ ও এর সৃজনশীল উপস্থাপনা এবারও বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ 'সুলতানার স্বপ্ন' অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাতা স্পেনের পরিচালক ইসাবেল হারগুয়েরা বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তরুণ চিত্রনির্মাতাদের জন্য দিনব্যাপী কর্মশালা পরিচালনা করেন। ডিসেম্বর ২০২৫-এ উদ্বোধন হয় 'পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন' শীর্ষক ঊনিশ তরুণ শিল্পীর চারমাসব্যাপী দৃশ্যশিল্প প্রদর্শনী। নারী পর্বতারোহীদল 'অভিযাত্রী' 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' শ্লোগান ধারণ করে এবারও শীতকালীন নেপাল হিমালয় শৃঙ্গজয়ের অভিযান পরিচালনা করেন যা হয়েছে বিশেষ উদ্দীপনামূলক। চলচ্চিত্র কেন্দ্র থেকে পরিচালিত কর্মশালা শেষে নবীন চিত্রনির্মাতারা 'নারীর আত্মনির্মাণ ও রোকেয়া' শীর্ষক আটটি সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি জাতীয় চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা, সমতার সমাজ ও গণতন্ত্রের আদর্শবহ কর্মকাণ্ডে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ জাদুঘরে নবপ্রাণ সঞ্চার করছে। সবার সহযোগিতায় পরিচালিত জাদুঘরের কর্মকাণ্ডে অনেক অপূর্ণতা ও ঘাটতি রয়েছে, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে সবাই তা দেখবেন, সেটা আমরা কামনা করি। প্রত্যাশা করি সবার সহযোগিতাও।

কৃতজ্ঞতা জানাই সবাইকে।

পুনরায় সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

মুজিবনগর দিবস উদযাপন

১৭ এপ্রিল ২০২৬

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানে ‘মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকার: গঠন ও তাৎপর্য’ শিরোনামে বক্তৃতা প্রদান করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান।

আয়োজনের শুরুতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী বলেন, ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠনে যারা ভূমিকা রেখেছেন, তাদের প্রতি গভীর সম্মান জানান। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে বড় অর্জন এ দেশে আর কিছু হতে পারে না। আর সেই মহান কাজটি তৎকালীন মুজিবনগর সরকার সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন এক অসম যুদ্ধে, দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

তথ্য-মাধ্যমের বন্ধু এবং সামাজিক মাধ্যমে উপস্থিত সকলের কাছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন “প্রায় দুই বছর আগে এ দেশে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ও পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ভাস্কর্য ধ্বংস করা হয়েছিল; যার মধ্যে মেহেরপুরের স্মৃতি স্মারকটিও ছিল। আমরা ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে আজ এই আবেদন জানাচ্ছি– এই ঐতিহাসিক স্থানটি সংস্কার করুন, পূর্বের অবস্থায় সংরক্ষণ করুন। এই দায় আমাদের সর্বজনের।”

মূল বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠনের পটভূমি এবং গঠনের পূর্ববর্তী জটিলতা সম্পর্কে আলোকপাত করে অধ্যাপক ফায়েক উজ্জামান বলেন, অনেক ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকায় এই সরকারকে ‘অস্থায়ী সরকার’ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার। বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতাও সেই সরকারের মধ্যেই নিহিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা এই সরকারকে একটি রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার হিসেবে চিহ্নিত করে।

তিনি আরও বলেন, মে মাসের পূর্বে কিছু সামরিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সীমিত পরিমাণ অস্ত্র সহযোগিতা এলেও, তা ছিল অপর্যাপ্ত। মুজিবনগর সরকারের সক্রিয় তৎপরতার ফলেই মে মাসের পর ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি সরকারের সাথে আরেটি সরকারের আলোচনার ভিত্তিতে ভারী অস্ত্র সরবরাহ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করে। যারা এই সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত নন, তারা অনেক সময় এ নিয়ে কটাক্ষ বা উপহাস করে থাকেন বলে উল্লেখ করে বক্তা বলেন, অথচ এই সরকার আর্থিক খাত নিয়ে যেমন কাজ করেছে, তেমন নেতৃত্ব দিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়েও। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ১১ সামরিক সেক্টরের পাশাপাশি বেসামরিক প্রশাসনের জন্য জোনাল কাউন্সিল গঠন করে এ সরকার। সবদিকেই এ সরকারের বিচক্ষণ নেতৃত্ব বাংলাদেশের বিজয় ছিনিয়ে আনে।

অধ্যাপক ফায়েক উজ্জামান মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক কার্যক্রমের গুরুত্বও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিশনে সম্পৃক্ত করা হয়। বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি কূটনীতিকদেরও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। এইভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের একত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার ফলে মুক্তিযুদ্ধ একটি সর্বজনীন জনযুদ্ধে রূপ নেয়। তিনি বলেন, জনগণের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ছিল এই সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের পেছনে মুজিবনগর সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তি শিল্পী শিরীন ইসলাম ও ইকবাল খোরশেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম।

মোহাম্মদ জুলকার নাঈন, রিসার্চ ইন্টার্ন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

একাদশ বার্ষিক রেসিডেনশিয়াল স্কুলের উদ্বোধনী আয়োজন

“Learning from Genocide towards Peace and Justice” শীর্ষক ১১তম বার্ষিক রেসিডেনশিয়াল স্কুলের উদ্বোধন হলো ২৪ এপ্রিল ২০২৬। ২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য এই আবাসিক স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য গণহত্যা, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের বিষয়গুলো নিয়ে শেখা, ভাবা এবং আলোচনার একটি নতুন পথ তৈরি করে দেয়।

এ বছর আবাসিক স্কুল শুরু হয় দেশি বিদেশি ২৯ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে। ২৪ এপ্রিল সকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আয়োজন শুরু হয়। এরপর অংশগ্রহণকারীরা জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ১৯৭১ সালের গণহত্যা, মানুষের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ড. সারোয়ার আলী ‘গণহত্যা’ বিষয়টির তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিকসমূহ তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, গণহত্যা কেবল অতীতের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এর ধরণ ও প্রভাব আজও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাঁর বক্তব্যে ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। ড. শেল অ্যান্ডারসন গণহত্যা বিষয়ক আলোচনাকে একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেন। তিনি গণহত্যার ধারণাকে আন্তর্জাতিক আইন, রাজনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং দেখান যে, এটি একটি বহুমাত্রিক সমস্যা, যা কেবল একটি দেশের সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার বক্তব্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমসাময়িক বিশ্ব বাস্তবতা সম্পর্কে একটি সমন্বিত ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব এবং সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের (সিএসজিজে) পরিচালক মফিদুল হক তার বক্তব্যে ‘মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ’ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন। তিনি বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা অতীতের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তার মতে, অতীতের ঘটনাবলি সম্পর্কে সচেতনতা বর্তমানকে বোঝার এবং ভবিষ্যৎকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য অপরিহার্য। একই সঙ্গে তিনি সমসাময়িক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এই ধরনের অপরাধ এখনও বিশ্ববাসীর জন্য একটি বাস্তব ও উদ্বেগজনক বিষয়।

আবাসিক স্কুলের মেন্টর এহসান মাজিদ মুস্তাফা স্কুলের কার্যক্রম ও নিয়মাবলী তুলে ধরেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের চিন্তাভাবনাকে চ্যালেঞ্জ করতে এবং প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কমপ্লেক্সের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়, যেখানে রেসিডেনশিয়াল স্কুলের পরবর্তী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।

ইসরাত জাহান গোধুলী
স্বেচ্ছাসেবক, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্র আয়োজিত

The 1971 War in the Eyes of Pakistanis প্রামাণ্যচিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বহুমাত্রিক ব্যাখ্যাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবনের প্রয়াসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্র The 1971 War in the Eyes of Pakistanis প্রামাণ্যচিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্যারিস-নিবাসী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি নির্মাতা আমিরুল আরহাম পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটিতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালের নির্মমতা ও গণহত্যা নিয়ে পাকিস্তানি জনগণের উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়া চিত্রায়িত হয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল ২০২৬, বিকেল চারটায়, জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ আধুনিক ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ অধ্যায়, যেখানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংসতা বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি, নারীদের উপর সংঘটিত নির্যাতন এবং কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতি ইতিহাসে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে, সেই সময়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ কী দেখেছিল, কী জানত এবং বর্তমান তরুণ প্রজন্ম কীভাবে এই ঘটনাকে মূল্যায়ন করে।

চলচ্চিত্রটিতে রয়েছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানি ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী মানুষসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তির ভাষ্য। পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের অফিস কর্মী, রাজনীতিবিদ, পাকিস্তানি-বাঙালি সম্প্রদায় এবং সাধারণ নাগরিকদের মতামতও এতে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তানের সাবেক প্রভাবশালী আমলা, পরবর্তীতে লেখক ও রাজনীতিবিদ রোয়েদাদ খান (১৯২৩-২০২৪) এই চলচ্চিত্রে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন এবং ১৯৭১ সালের হত্যাকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

নির্মাতা আরহাম বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ট্র্যাজেডিকে অনুধাবনের সচেষ্ট ছিলেন। পাঁচ দশক পর এমন একটি ইতিহাস তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন. কারণ অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আর বেঁচে নেই, কিংবা অনেকে স্মৃতিশক্তি হ্রাসসহ নানা রোগে ভুগছেন। তবুও, তিনি লক্ষ্য করেন যে আজকের অনেক পাকিস্তানি বেসামরিক মানুষ স্বীকার করেন যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সেনাবাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছিল, সেসব সম্পর্কে তারা এখনো খুব ভালোভাবে জানেন না।

নির্মাতা আমিরুল আরহাম, যিনি ১৯৮৫ সাল থেকে প্যারিসে অবস্থান করছেন, তার চলচ্চিত্র নির্মাণের যাত্রা শুরু করেন ঢাকা ফিল্ম আর্কাইভ থেকে। পরবর্তীতে তিনি বিশ্বখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্রকার Jean Rouch -এর অধীনে চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র Social Business কান চলচ্চিত্র উৎসবের Cinéma Positive বিভাগে নির্বাচিত হয় এবং তার অন্যান্য কাজও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে।

প্রদর্শনীর পর নির্মাতার সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দর্শকরা সরাসরি তার সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পান। বিশেষ করে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্বিবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাসহ তরুণ দর্শকদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীতে দর্শক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকারকর্মী এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হামিদা হোসেন, আইনজীবী ও ব্লাস্ট-এর নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন, চলচ্চিত্র নির্মাতা মানজারে হাসিন মুরাদ।

এম. ফারহাতুল হক
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেখানে কোন দল হস্তক্ষেপ করেনি। হস্তক্ষেপ হয়নি ৯৮ সাল থেকে সরকারের অনুদানের সাথে জনগণের সহায়তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পরিচালিত এই জাদুঘরে। ব্যতিক্রম ঘটলো অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে। এই বর্ণনাটা সঠিক কিনা সেটি পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলো, অনুদান বন্ধ হলো কোনো ঘোষণা ছাড়াই। কিন্তু, জাদুঘরে দর্শনার্থী বাড়লো, জাদুঘরের কর্মসূচি আরো বেগ পেল।

তিনি মনে করেন সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরার দায় সর্বজনের। এই দায় এই দেশের মানুষ পালন করবে এ ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বিস্মৃতি, বিকৃতি ও বিভ্রান্তির কৌশলী প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সর্বজনের কাছে এই ইতিহাসটা পৌঁছে দেওয়ার। যতবেশি পৌঁছাবে, ততবেশি মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে, গণহত্যাকারী ও তার সহযোগীদের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত হবে, ততবেশি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা জানবে। তবেই একটি মানবিক সমাজ, সংঘাতহীন সমাজে মানুষ জয়ী হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক। তিনি তিরিশ বছরের পথচলায় দুটি অর্জনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রথমত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জনমানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক দানে গড়ে উঠেছে মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সর্ববৃহৎ তথ্যভাণ্ডার, যা জাদুঘরের সুপরিসর চারটি গ্যালারিতে উপস্থাপিত প্রদর্শনীকে যেমন তথ্যমূলক, ঐতিহাসিক ও শিক্ষামূলক করেছে, তেমনি অনেক চিত্ত-আলোড়নকারী স্মারক দ্বারা তা করে তুলেছে গভীরভাবে মানবিক। একই সাথে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিসরেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশিষ্ট স্থান করে নিতে পেরেছে।

মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও অনুষ্ঠান আয়োজনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর পাশাপাশি জাতীয় চেতনা, অসাম্প্রদায়িক-সমতার সমাজ ও গণতন্ত্রের আদর্শবহ কর্মকাণ্ডে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ জাদুঘরে নবপ্রাণ সঞ্চার করছে। সবার সহযোগিতায় পরিচালিত জাদুঘরের কর্মকাণ্ডে অনেক অপূর্ণতা ও ঘাটতি রয়েছে যা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে সবাই দেখবেন বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।

বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক '১৯৭২-এর সংবিধান: আদর্শ, পরবর্তী বাস্তবতা ও সমকালীন আলোচনা' শিরোনামে মূল বক্তব্যে '৭২-এর সংবিধান রচনার পটভূমি ব্যখ্যা করে বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে গণপরিষদে ৩৮৬ জন সদস্য ছিলেন; তারা প্রত্যেকে এসে মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করলেন এবং এই স্বাক্ষরটা দিয়ে তারা সংবিধানকে অনুমোদন করলেন। একই সাথে গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন। তারা জানতেন, বুঝতেন যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে; তারা এই কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন এবং স্বাক্ষর করে গণপরিষদ থেকে ইস্তফা দিলেন বা পদত্যাগ করলেন। ইতিহাস কিন্তু খুব কম দেশেই আছে; যেখানে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করে, গ্রহণ করে, কার্যকর করে চলে গেছে। তিনি বলেন বাহাত্তরের সংবিধানটা ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পুরো এক বছর ধরে আলাপ-আলোচনা করে, তর্ক-বিতর্ক করে, ভালো-মন্দ যাচাই করে। গণপরিষদের সদস্যরা, বহু দেশের সংবিধান থেকে উদাহরণ টেনেছেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন ওনারা এগুলা জানলেন কেমন করে! তাঁরা আলাপ-আলোচনা করেছেন, তর্ক-বিতর্ক করেছেন, পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন– এটাই সংবিধানের মূল শক্তি। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আইন হওয়া, প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবিধান হওয়া– এটা হলো আইন মান্য করা এবং সংবিধান মান্য করার মূল যুক্তি। তিনি মনে করেন বিভিন্ন সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাহাত্তরের সংবিধানকে দুর্বল করা হয়েছে এবং প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

পরিশেষে ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যম এবং সংগীত পরিবেশন করেন ওয়ার্দা আশরাফ।

স্মৃতিতে একাত্তরে শহীদ শেখ জাকারিয়া ও শিশুকন্যা সায়রা বানু

৯ এপ্রিল জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচি। মিরপুর ইম্পিরিয়াল স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। শহীদ শেখ জাকারিয়ার পুত্র বশির আহমেদ স্মৃতিচারণ করেন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বাবা এবং বোনের নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনা তুলে ধরেন। হৃদয়বিদারক সেই ঘটনা তিনি তার মা বদরুন্নেসার মুখে শুনেছিলেন।

শেখ জাকারিয়া স্ত্রী ও নয় ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসবাস করতেন মিরপুর ১১ নম্বর সেকশনে। সোবহানবাগে একটি দোকানে দর্জির কাজ করে সংসার চালাতেন তিনি। ২৫ মার্চের কালরাতে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে শেখ জাকারিয়া সারা রাত জেগে ছিলেন। চারদিকে গোলাগুলির শব্দ। মিরপুর বিহারি অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় বাঙালিরা ছিল সংখ্যালঘু তাই বাঙালিদের উপর বিহারিদের ক্ষোভ আগে থেকেই ছিল। যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে সেই ক্ষোভ আরো প্রকট আকার ধারণ করে। ২৬ মার্চ ভোর রাত থেকেই বিহারিরা শুরু করে বাঙালি নিধনযজ্ঞ। এই অবস্থায় শেখ জাকারিয়া স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আত্মরক্ষার্থে সোবহানবাগের দোকানে গিয়ে ওঠেন। দোকানের পেছনে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে কোনরকমে এগারজন বসবাস করতে থাকেন। দুই তিন মাস পর তিনি পরিবার নিয়ে ঝিগাতলায় আশ্রয় নেন। সেখানে থাকাকালীন শেখ জাকারিয়ার সাথে তাঁর বন্ধু মো: হাকিমের দেখা হয়। মো: হাকিম মুক্তিযোদ্ধাদের একজন সাহায্যকারী ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে শেখ জাকারিয়া অত্যন্ত খুশি হন এবং সাহায্য করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তারপর থেকে মো: হাকিম শেখ জাকারিয়ার সোবহানবাগের দর্জির দোকানে গোপনে ব্যাগে করে গোলা-বারুদ, গ্রেনেড ইত্যাদি জিনিস রেখে যেত আর রাতে এসে সেগুলো আবার নিয়ে যেত। এদিকে পাকসেনারা মুক্তি আছে কিনা বলে তাঁর দোকানে প্রায়ই খোঁজ নিতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার এক দেড় মাস পর কোরবানি ঈদ উদযাপিত হয়। যদিও সেই ঈদের আনন্দ বাঙালিদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। ঈদের দুই/চার দিন পর শেখ জাকারিয়া লোকমুখে খবর পান বাঙালিরা তাদের বাড়ি ঘরের খোঁজে মিরপুরে যাচ্ছে। এই খবর পেয়ে তিনি মনস্থির করেন মিরপুরে যাবেন। ১৯৭২ সালে জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে তিনি আর দেরি না করে স্ত্রী বদরুন্নেসা ও দুই মেয়েকে নিয়ে রওনা হন মিরপুরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মিরপুর তখনও স্বাধীন হয়নি। পরিস্থিতি খারাপ দেখে শেখ জাকারিয়া তাদের নিয়ে উঠেন মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে অবস্থিত হাজির বিল্ডিংয়ে। এই হাজির বিল্ডিংয়ে অনেক বাঙালি পরিবার তখন আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিন রাতে বিহারিরা পাকসেনাদের কাছে খবর পৌঁছে দেয় যে, এই বিল্ডিংয়ে অনেক বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধা লুকিয়ে আছে। এই তথ্য পাওয়ার সাথে সাথেই পাকসেনারা সে রাতেই হাজির বিল্ডিং ঘেরাও করে। সেখান থেকে পালানোর কোন উপায় ছিল না। ৩০ জানুয়ারি সকাল হবার সাথে সাথে বিহারিদের নিয়ে পাকসেনারা হাজির বিল্ডিং আক্রমণ করে এবং পুরুষদের হত্যা করে। বিষয়টি শুনতে পেয়ে বদরুন্নেসা শেখ জাকারিয়াকে ঘরের কোণে মেঝেতে শুইয়ে দেন এবং শরীর কাঁথা দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে দুই মেয়েকে নিয়ে স্বামীর শরীরের উপর বসে থাকেন। তখনই পাকসেনারা সেখানে আসে। ঘরে ঢুকে প্রথমে শেখ জাকারিয়ার বড় মেয়ে সায়রা বানু যার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর, তার বুকে একটি গুলি করে। নিষ্পাপ মেয়েটি তখন পানি পানি বলে চিৎকার করে উঠে। মেয়ের সেই হৃদয়বিদারক চিৎকারে বাবা শেখ জাকারিয়া আর কাঁথার ভেতরে থাকতে পারেননি। কাঁথার ভেতরে থেকে মুখ বের করতেই চারটি গুলিতে শেখ জাকারিয়ার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়। সাথে সাথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে সায়রা বানু তখনও বেঁচে ছিল, কিন্তু পাকসেনারা যাওয়ার সময় আবার তাঁর মাথায় একটা গুলি করে চলে যায়। বদরুন্নেসা স্বামী ও মেয়ের লাশ নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। বদরুন্নেসা সেদিন তার কোলের ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে আশরাফ নামে এক প্রতিবেশীর সহায়তায় সেখান থেকে পালিয়ে কচুক্ষেতের একটি স্কুলে আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য, এই আশরাফের ভাইকেও পাকসেনারা সেদিন হাজির বিল্ডিংয়ে হত্যা করেছিল। ঐ ঘটনার ঠিক দুই দিন পর আশরাফ তার ভাইয়ের লাশের খোঁজে হাজির বিল্ডিং-এ যায়। তার ভাইয়ের লাশের সাথে শেখ জাকারিয়ার লাশটিও নিয়ে আসেন। কিন্তু ছোট শিশু সায়রা বানুর লাশটি সেখানে আর পাওয়া যায়নি বা তিনি আর নিয়ে আসেন নি। কচুক্ষেতে একটি জায়গায় গর্ত করে কোনরকমে তাদের দুজনের লাশ কবর দেওয়া হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের হাতে নির্মম মৃত্যু হয় শেখ জাকারিয়ার। মর্মান্তিক এই ঘটনার স্মৃতি বদরুন্নেছা তার সন্তানদের শুনিয়েছিলেন। বশির আহমেদের মুখে পিতা শহীদ শেখ জাকারিয়া ও তার বোন সায়রা বানুর সেই নির্মম মৃত্যুর ঘটনা আবারো উন্মোচিত হলো। এভাবেই জল্লাদখানায় সাপ্তাহিক স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একাত্তরে শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকথা জানিয়ে চলেছে নতুন প্রজন্মকে।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী ডালিয়া নওশিনের স্মৃতিভাষ্য

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১৬ জানুয়ারি ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ স্বাধীন বাংলা বেতারের ও বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীসংস্থার কণ্ঠযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী ডালিয়া নওশিন গত ১ এপ্রিল ২০২৬ প্রয়াত হন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগৃহীত তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হলো–

আমরা যারা মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীসংস্থাতে ছিলাম আমার মনে হয় আমাদের স্কোয়াডটা সর্বপ্রথম কলকাতায় তৈরি হয়। তখন কিন্তু অন্যান্য স্কোয়াড তৈরি হয়নি। স্বাধীন বাংলা বেতার চালাচ্ছিল তাদের প্রোগ্রাম। ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করেছিল ওরা। কল্যাণীদিরা একটা গ্রুপ করেছিলেন। উনি ছিলেন, রফিকুল আলম ছিলেন, কল্যাণীদি'র পুরো ফ্যামিলি ছিলো। আমি যখন পৌঁছলাম তখন মে মাসের ১ বা ২ তারিখ। পরের দিনই আমরা ১৪৪ লেনিন সরণীতে গিয়েছিলাম। যেখানে মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীসংস্থা'র রিহার্সাল হচ্ছিল। প্রতিদিন রিহার্সাল হতো। আমরা বলতাম কালচারাল স্কোয়াড। মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীসংস্থার সবচেয়ে ভালো একটা জিনিস ছিল, একটা সুন্দর গীতি আলেখ্য'র মতো তৈরি করা হয়েছিলো। 'রূপান্তরের গান' যেটা শাহরিয়ার কবীর আমাদের লিখে দিয়েছিলেন। ৫২'র আন্দোলন থেকে নিয়ে ৭১-এর যুদ্ধ পর্যন্ত পুরো ইতিহাসটা উঠে এসেছিল সেখানে। ওইটাতে প্রায় ১৫-১৭টা গান আমরা গেয়েছিলাম। গানগুলো নির্বাচন করেছিলেন– ওয়াহিদ ভাই ও সন্‌জীদা

আপা।
আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছি, নজরুল গেয়েছি, দেশের গান গেয়েছি, পল্লিগীতিও গেয়েছি এবং বেশিরভাগ সব গণসঙ্গীত ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

‘পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন’ প্রদর্শনীর সমাপনী

৩১ মার্চ, ২০২৬

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও কলাকেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে ‘পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন’ প্রদর্শনীর শেষ দিন ৩১ মার্চ ২০২৬, শিল্পী ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে প্রদর্শনী পরিভ্রমণের আয়োজন করা হয়। এসময়ে সাংবাদিকবৃন্দের সাথে শিল্পীরা তাদের কাজ নিয়ে সরাসরি আলাপ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

দীর্ঘ প্রায় চার মাসের প্রদর্শনীর শেষ দিনে শিল্পী দিপ্তী দত্ত বলেন আমার ধারণা ছিল না যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কী করে, আমাদের জাদুঘরগুলো কী করে! মনে হতো আমাদের জাদুঘরগুলো নিজেরাই একটা জীবাশ্মে পরিণত, নিজেরা সচল না। জাদুঘর বলতে আসলে তো সে অতীত নিয়ে কাজ করে, কিন্তু সে নিজে মৃত থাকে না। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যখন এধরণের একটি আয়োজন করেছে, তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা জীবিত আছে। কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জাদুঘরের বিবেচনাকে পুনর্বিবেচনা করছে এবং কীভাবে তার পরিধিকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে কী ধরনের সংলাপ আহবান করতে পারে– তার একটি নমুনা হচ্ছে এই প্রদর্শনী। অংশগ্রহণকারী আরেক শিল্পী সুমনা বলেন আমি সুলতানার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করতে এসে অনুভব করেছি যে, আসলে স্বপ্নটা কী– সেটাই আমরা এখনো জানিনা! আমি অনেকের কাছেই তাদের স্বপ্ন জানতে চাই। আমাকে ৩০-৪০ জন তাদের স্বপ্নের কথা বলেন। এখান থেকে আমি কিছু সিলেক্ট করে স্বপ্ন নিয়ে কাজ করেছি। কাজ করতে গিয়ে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। কারণ, সবগুলো স্বপ্নই নিজের সাথে মিলে যায়। তারপরে অন্যের স্বপ্ন আমি শিল্পী হিসেবে কীভাবে পেইন্টিং এ নিয়ে আসবো– তা আমার জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। আমি জানি না কতটুকু করতে পেরেছি। আপনারা দেখেছেন, আপনারা যেভাবে ভাবতে চান ভাবতে পারেন।

শিল্পী রিয়া উল্লেখ করেন সবার কাজটা এখন যেভাবে রয়েছে, প্রথমে তা সেভাবে ছিল না। শিল্পীরা গ্রুপে গ্রুপে কথা বলেছে, অনেক পরিবর্তন এনেছে, অনেক লেয়ার যুক্ত হয়েছে, অনেককিছু আবার বাদ দিয়েছে। তার মনে হয়েছে, এরকম ইনিসিয়েটিভ বারবার নেওয়া উচিত। বৃষ্টি কাজ করেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে। তার কাছে ১০০ বছর আগে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ যে ক্রাইসিস নিয়ে হয়েছিল– বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস মনে হয় শিশুদের নিয়ে। তিনি বলেন, এই যে আমরা Neurodivergent বা Neurotypical আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আমরা শুধু আমাদের কথা চিন্তা করছি। সমাজের সকল ডিসিশন হচ্ছে আমাদের কথা চিন্তা করে– সেটা আসলে হওয়া ঠিক না। ওদেরকে নিয়েও আমরা একসাথে চিন্তা করতে পারি।

কলাকেন্দ্রের পরিচালক শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান বলেন, শিল্পীরা তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে যে উপস্থাপনটা এখানে আনলেন– এটা তাদের নিজস্ব শিল্পচর্চার, সৃজনশীলতার পরিচয়। পাশাপাশি তিনি মনে করেন এমন একটা প্রদর্শনীকে সার্থক করার জন্য শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে এটাকে কেন্দ্র করে যে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় তার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা উপলব্ধি করেছেন নিজ নিজ সীমাবদ্ধতাগুলো। শিল্পীদের নিজস্ব শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এই চর্চাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, ভবিষ্যতে শিল্পীদের সঙ্গে এই প্রদর্শনীর সূত্রে জাদুঘরের যে সম্পর্ক, সেটা আরো সৃজনশীলভাবে নিবিড় করার বিবেচনা জাদুঘরের রয়েছে। একটা ক্যাটালগ বের করার পরিকল্পনা আছে। শিল্পী ওয়াকিলুর রহমান ডিজাইন করে দিলে–সেটারও পাবলিকেশন হবে। প্রদর্শনীর কিছু ডকুমেন্টেশনও জাদুঘরে করা রয়েছে। ফলে প্রদর্শনীটা শেষ হবে, তবে তিনি মনে করেন, এর যে বার্তাটা, তা যেন সকলে বহমান রাখতে পারে– সমাজের সঙ্গে নানাভাবে বিষয়টা নিয়ে আসতে পারে।

ডালিয়া নওশিনের স্মৃতিভাষ্য

৫-এর পৃষ্ঠার পর

গেয়েছি আমরা। যেমন ওয়াহিদ ভাই শেখালেন ‘দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখ গান গাহিয়ে’। আমার মনে হয় ফ্লোরা আপা ভীষণ দরদ দিয়ে গাইতেন। প্রথম গানটাই ছিলো ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’। ‘যশোর-খুলনা-বগুড়া-পাবনা-ঢাকা-বরিশাল-নোয়াখালী’ এই গানটা নবরূপে গাওয়া হতো।

আমাদের রূপান্তরের গানটা যেহেতু গীতিআলেখ্য ছিল, কিছুটা ন্যারেশনের দরকার ছিল। হাসান ইমাম ভাই ওখানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। দু-একবার আলী যাকের কণ্ঠ দিয়েছিলেন। মুস্তফা মনোয়ার আমাদের স্টেজ ডিজাইন করেছিলেন। মুস্তফা মনোয়ার লাইটিং আর স্টেজটা করে দিয়েছিলেন যা দেখে দিল্লীর ওই প্রোডিউসাররা একদম অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমরা ওনাদের শোনাচ্ছি আমরা যুদ্ধটা কেন করছি কার বিরুদ্ধে করছি। ‘রূপান্তরের গান’ জুন মাসের ৩ তারিখের দিকে কলকাতায় প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে টিকিটের বিনিময়ে পরিবেশিত হয়েছিল। সত্যজিৎ থেকে শুরু করে সব গুরুত্বপূর্ণ মানুষজন সেটা দু'দিন ধরে দেখলেন। অনেক প্রশংসা পেয়েছিল। তারপর আমরা যেটা করেছি সেটা হলো প্রত্যেকদিন আমরা কলকাতার আশপাশের সব জায়গায় গিয়েছি। মাঝে মাঝে আমরা ২/৩টা করে প্রোগ্রাম করেছি একদিনে। সল্টলেকের মতো একটা জায়গায় মনে আছে আমরা গান গাইতে গিয়েছিলাম। বিশাল জায়গা ঘরের সমান এত বড় বড় মুখওয়ালা পাইপ। সেই পাইপের ভেতরে মানুষ ফ্যামিলি নিয়ে থেকেছে। আমি প্রথম ওখানে গিয়ে দেখেছি বালতি করে খাবার নিয়ে এসে দিচ্ছে। দিল্লীতে যখন গেলাম তখন ঋত্বিক ঘটক এসছিলেন আমাদের সাথে দেখা করতে। উনি এসে বসলেন। উনি প্রথমে ফ্লোরা আপাকে বসিয়ে বললেন, গাওতো দেখি ‘তোমার স্বার্থক জনম আমার’। ওনাকে শোনানো হলো ওটা। দিল্লীতে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন গিয়েছিলাম। নন্দিনী সদপতি আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। বুলবুল আপার হাজবেন্ড হাইকমিশনে ছিলেন। উনি পাকিস্তানের পদ ত্যাগ করে বাংলাদেশের হয়ে কাজ করছিলেন। এত সম্মান দিয়েছেন আমাদের যে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। গান্ধী ইনস্টিটিউট থেকে আমাদের ইনভাইট করা হয়েছিল। তারপরে আমরা চলে গিয়েছিলাম জহরলাল নেহেরু ইউনির্ভাসিটিতে। ওখানে গিয়েছিলাম আমরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী সদস্য কল্পনা দত্তের সূত্রে। উনি তখন দিল্লীতে ছিলেন। আমাদের অনেক আদর করেছেন। ওনার কথা শুনে আমরা উজ্জীবিত হয়েছি।

স্বাধীন বাংলা বেতারে আমরা গিয়েছি অনেক পরে জুন মাসে। সমর দাস স্বাধীন বাংলা বেতারে ছিলেন। অজিতদাকে আমরা ওখানে পেয়েছি। আমার মনে আছে রথীনদা'কেও দেখেছি। আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছিলাম। শরণার্থী ক্যাম্পে গেছি, আসানসোলে গেছি ট্রাকে করে। লেয়ার লেভিন নামক একজন মার্কিন চলচ্চিত্রকার এসেছিলেন। ওনার আইডিয়াটা হলো তাহলে ট্রাকে করে তোমাদের নিয়ে শুট করি। সেই ফুটেজ নিয়ে পরবর্তীতে মুক্তির গান হয়েছে। আমরা সবাই শুটিংয়ে ছিলাম না। ওখানে শাহীন আপা, বেনু ভাই,স্বপন চৌধুরী, বিপুল, মোশাদ আলী, তবলায় দেবু, শিলাদি, শর্মীলিদি, শারমীন, লুবনা, তারিক ভাই ছিলেন।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে কিছু জায়গা মুক্ত হয়েছিল। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে গেয়েছি এবং ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করতো। ওরা জানতো আমরা এসে গান শোনাবো ওদেরকে। তখন কিন্তু আমরা ‘আমার সোনার বাংলা’ বেশ কয়েকবার গেয়েছি। তারপর ‘ও আমার দেশের মাটি’ গেয়েছি। ওরা নিজের বাবা -মাকে মিস করতো। ছোট ছোট ছেলেপেলেরা চলে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে, জানে না ফেরত যেতে পারবে কি না। প্রোগ্রাম শেষ হলেই বলতো আবার কবে দেখা হবে। প্রথমে যখন গান গাচ্ছি সবাই হইচই করতো কিন্তু যখন চলে আসবো সবাই কেমন যেন চুপচাপ, বিমর্ষ হয়ে যেতো।

সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমাজ সেবক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতায় আমাদের অভিভাবক। দীপেনদাদের একটা অর্গানাইজেশন ছিল ‘বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’। ওনারা আমাদেরকে স্পন্সর করতেন, পেট্রোরোনাইজ করতেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপ্যাধায়, দ্বীজেন মুখোপ্যাধায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, নিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এনারা সবাই ছিলেন। আমরা ওনাদের শুধু সান্নিধ্য পেয়েছি তা নয় আমরা ওনাদের কো-অপারেশনও পেয়েছিলাম। দীপেনদার ফ্যামিলিকে জোগাড় করা গেলে ইতিহাস জানা যাবে। এখন আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যদি মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীসংস্থাকে এক জায়গায় করতে পারে এবং এই তথ্যগুলো যদি আমরা যোগাড় করতে পারি তাহলে একটা বিরাট ইতিহাস উঠে আসবে।

১৯৭২ এর সংবিধান: আদর্শ, পরবর্তী বাস্তবতা ও সমকালীন আলোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উনি ওখানে বলেছিলেন, ইতিহাস হলো অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা চলমান আলোচনা। ক্ষেত্রবিশেষে চলমান বিতর্ক। অতীতকে আমরা যখন বর্তমানে থেকে দেখি, ৫০ বছর বা ৬০ বছর আগের অতীত যখন আমরা আলোচনা করি তখন বর্তমানের রাজনৈতিক চিন্তা, সামাজিক চিন্তা, আদর্শগত চিন্তা, বর্তমান বাস্তবতা আমাদের প্রভাবান্বিত করবেই। ঘটনা দেখার মধ্যে একটা বর্তমান লেন্স চলে আসবে এবং ঈধৎৎ বলেছিলেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই লেন্সটা যেন এত পক্ষপাতদুষ্ট না হয়, যাতে ইতিহাসটা বিকৃত হয়ে যায়। এই সাবধানবাণী মনে রেখে শুরু করি।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ইতিহাস আমার দৃষ্টিতে শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা দুটি রাষ্ট্র রেখে গেল পাকিস্তান এবং ভারত। ব্রিটিশ উপনিবেশ আমাদের শাসন করেছে নির্বাহী একটা যন্ত্রের মাধ্যমে, যেখানে জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা মোটেও মুখ্য ছিল না, মুখ্য ছিল তাদের একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল কর আহরণ এবং সম্পদ লুণ্ঠন। এই কাঠামোয় আগে যারা সাদা চামড়ার ব্রিটিশ ছিল, তাদের জায়গায় পাকিস্তানি আর্মি এবং আমলারা সেই স্থান দখল করলো। আমরা ২-৪ বছরের মধ্যেই টের পেলাম এই কাঠামোর মধ্যে আমাদের কোনো স্থান নাই। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন ছিল প্রথম প্রতিবাদ যে, আমরা এই কাঠামোর অধীনে থাকতে রাজি না। ৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ছিল ঔপনিবেশিক পাকিস্তানকেন্দ্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ। বিদ্রোহ বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, যুক্তফ্রন্টের সরকার কয়েক মাসের মধ্যেই ভেঙে দিল। পাকিস্তানের শাসকরা কখনই চায় নাই জনপ্রতিনিধিত্বের একটা ভূমিকা থাকবে। ৫৬-তে একটা সংবিধান হলো, ৫৮-তে বাতিল হয়ে গেল। ৬২-তে সংবিধান হলো, ৬৯-এ বাতিল হয়ে গেল।

১৯৭০ সালের নির্বাচন কিন্তু সংসদ নির্বাচন ছিল না, ঐটা ছিল গণপরিষদের নির্বাচন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সংবিধান ছিল না; সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যই ১৯৭০ সালের নির্বাচন হলো। এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লড়েছিল সাংবিধানিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। এটা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জন্য গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব। তারপর ২৫ শে মার্চ গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ–শেষে ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। ১৯৭১ এ আমাদের স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র, সেটার প্রথম বাক্য ছিল– '১৯৭০ সালে একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য দেশে নির্বাচন হয়েছিল'। তারপর বলা হয়েছে, 'জনগণ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে সংবিধান প্রণয়নের জন্য, অতএব, এই সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করছি'। দেশ স্বাধীন হলো। পহেলা মার্চ সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদের যে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, সেটা হয় ১০ই এপ্রিল, ১৯৭২ সালে, অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রথম বার্ষিকীতে। এই গণপরিষদ কিন্তু এপ্রিল থেকে সংবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত, মানে ডিসেম্বর ৭২ পর্যন্ত, কোনো আইন পাশ করে নাই। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা দুইটা থেকেই তারা অনুধাবন করেছিলেন যে, প্রথম আমাদের দরকার সংবিধান।

১০ই অক্টোবর, ১৯৭২ গণপরিষদে সংবিধান নিয়ে আলোচনা শুরু হলো, ৪ঠা নভেম্বর প্রাথমিকভাবে সেটা অনুমোদন হলো এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান কার্যকর হলো, আমাদের মুক্তির প্রথম বার্ষিকীতেই সংবিধান কার্যকর হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে গণপরিষদে ৩৮৬ জন সদস্য ছিলেন, তারা প্রত্যেকে এসে মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করলেন এবং এই স্বাক্ষরটা দিয়ে তারা দুটা জিনিস করলেন– সংবিধানকে অনুমোদন করলেন একই সাথে গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন। তারা জানতেন, বুঝতেন যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে; তারা এই কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন এবং স্বাক্ষর করে গণপরিষদ থেকে ইস্তফা দিলেন বা পদত্যাগ করলেন। ইতিহাস কিন্তু খুব কম দেশেই আছে; যেখানে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করে, গ্রহণ করে, কার্যকর করে চলে গেছে, নিজের মেয়াদ বৃদ্ধি করে নাই ।

সংবিধানে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সংবিধানের মূল যেটা মন্ত্র ছিল– এসব প্রতিষ্ঠান আমরা করছি জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাটা সীমিত করতে হবে। পুরো সংবিধানটাই ছিল ক্ষমতা সীমিত রাখার একটা রূপরেখা। সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে যে কথাটা বলা হয়েছিল– 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। অনেক নেতারা বলেন যে, প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার উৎস জনগণ। উৎস জনগণ না, মালিক জনগণ। ৭২ সালে যারা সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, তারা এটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আমি বলতে চাচ্ছি না যে, সংবিধানটা নিখুঁত ছিল। অবশ্যই কোনো সংবিধানই নিখুঁত না। সংবিধানে হয়তো অনেক গোষ্ঠী-গোত্র বা জাতিসত্তার মতবাদের প্রতিফলন হয় নাই। অনেক বিকল্প প্রস্তাব– এবং বহুবাদিত্ব হয়তো স্থান পায় নাই। কথা হলো, কোনো সংবিধানই নিখুঁত না, আমাদের সংবিধানও নিখুঁত না, কিন্তু সংবিধানের এই যে প্রক্রিয়াটা এবং যে জিনিসটা মাথায় রেখে সংবিধান করা হয়েছিল, সেটা কিন্তু ইউনিক।

আমাদের দুর্ভাগ্য, যে জনগণের ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য যে সংবিধান করা হয়েছিল, তার উপরে প্রথম আঘাতটা আসলো ৭ মাসের মাথায়। দ্বিতীয় বছরের মাথায় দ্বিতীয় সংশোধন। এখানে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আসা শুরু করলো সংশোধনীগুলো আসার মাধ্যমে।

একটা অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি– 'জরুরি অবস্থা ঘোষণা'। সংবিধানে ৬৩ অনুচ্ছেদে ছিল যে, যুদ্ধের আশঙ্কা অথবা যুদ্ধে বাংলাদেশ লিপ্ত হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার সাথে সাথেই সংসদ অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। সেটা দ্বিতীয় সংশোধনীতে পরিবর্তন করে বলা হলো সরকারের কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকলেই সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে। রাষ্ট্রপতির কাছে যদি প্রতীয়মান হয় যে দেশের সঙ্কটাবস্থা বিদ্যমান, তাহলেই জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবে। জরুরি অবস্থা জারি করে আমাদের অধিকার স্থগিত করতে পারবে। যেটা বাহাত্তরে করা হয়েছিল শুধু যুদ্ধের সময়ের জন্য, সেটা এখন যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় জারি করা যায়। চতুর্থ সংশোধনীতে ৩১টা ধারা পরিবর্তন করা হয়েছিল; রিট মামলা হলো অধিকার রক্ষার মামলা। আমি যদি মনে করি, সংবিধান প্রদত্ত কোনো অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, কোনো সরকারি পদক্ষেপে আমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তখন আমরা রিট মামলা করি। চতুর্থ সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের এই রিট মামলার অধিকার বা ক্ষমতাটাই ডিলিট করে দেয়া হলো। বাহাত্তরে সংবিধান যে আদর্শের জন্য করা হয়েছিল, তা থেকে বিচ্যুতি শুরু করতে বেশি দিন সময় লাগে নাই। তারপরে অগাস্টে পট পরিবর্তনের পরে ২০টা মার্শাল ল' ফরমান জারি করে সংবিধান সংশোধন করা হলো। অর্থাৎ সংবিধান তার সর্বোচ্চ স্থান হারালো। তারপর ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এক কথায় বলে দেয়া হলো, সামরিক ফরমান দ্বারা সংবিধানের যেগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে, সবগুলো জায়েজ। এটা আবার ৮৬ সালে আমরা পুনরাবৃত্তি করলাম। আবার সামরিক শাসক আসলো, ফরমান জারি করলো। আমাদের যেই অবক্ষয় ৭৩ সালেই শুরু হয়েছিল, সেটা এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ালো, সামরিক শাসকের মনে হয়েছে, এইটা খুব জরুরি, এইটার পরিবর্তন আজকেই করা দরকার; আজকেই ফরমান জারি করে বসলেন।

বাহাত্তরের সংবিধানটা ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পুরো এক বছর ধরে আলাপ-আলোচনা করে, তর্ক-বিতর্ক করে, ভালো-মন্দ যাচাই করে, গণপরিষদের সদস্যরা, বহু দেশের সংবিধান থেকে উদাহরণ টেনেছেন। আমি এখন যখন পড়ি, আসলেই আশ্চর্য লাগে এগুলো জানলেন কেমন করে! বাহাত্তর সালে– তখন দেশে বোধহয় কোনো সড়কে ব্রিজ ছিল না। ১ কোটি শরণার্থী ইন্ডিয়া থেকে ফিরে আসছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নাই। এত কিছুর মধ্যেও তারা এইসব আলাপ-আলোচনা কেমন করে, কোথা থেকে করলেন! এই আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল, পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি হয়েছিল– এটাই কিন্তু সংবিধানের মূল শক্তি। ফরমান দিয়ে সংবিধান হয় না। এই যে প্রক্রিয়াটা–এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আইন হওয়া, প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবিধান হওয়া– এটা হলো আইন মান্য করা এবং সংবিধান মান্য করার মূল যুক্তি।

আমরা সবাই বলি যে, লোকে আইন মানে না। কিন্তু এটা কেউ চিন্তা করি না যে, যখন আইনটা সংসদে হয়, সেটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা তো আমি খুঁজে পাই না। আইন লোকে মানার আগে, যদি তারা জানতে পারে, বুঝতে পারে যে, আইনটাতে কী লাভ হবে, কী ক্ষতি হবে, কী ক্ষতি ঠেকাতে এই আইনটা করা হচ্ছে এবং এই আইনটা প্রয়োগ হলে তারা কীভাবে লাভবান হবে– এই আলোচনার মধ্যে আমাদের জনগণের কিন্তু কোনো অংশগ্রহণ থাকে না। কারণ, সংসদে আইন নিয়ে আলোচনা হয় না।

এখন বর্তমানে আসি, আমার মনে হয়, দেশে আইনের শাসন গত কয়েক বছর ধরেই ছিল না। আইনের শাসন নাই কেন? আইনের শাসন না থাকার দোষ কিন্তু আইনের না। এটা আইনকে যারা অপপ্রয়োগ করে, দোষ তাদের। যারা আইনটাকে ব্যবহার করে, অপপ্রয়োগ করে বা নিজেদের স্বার্থে করে, আমরা তাদের কথা ভুলে গিয়ে যদি আইনকে দোষ দেই, তাহলে বোধহয় সুবিচার করা হবে না। আবার বলছি– বাহাত্তরের সংবিধান নির্ভুল ছিল না। কিন্তু এই গত কয়েক বছরের স্বৈরশাসন, জবাবদিহিহীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা– এটা সংবিধানের দোষ না, সংবিধানকে যারা বারবার অপব্যবহার করেছে তাদের। চতুর্থ সংশোধনী উপস্থাপনের ২ ঘণ্টার মধ্যেই পাস হয়ে গেছে, যেটা সবচেয়ে সর্বনাশা সংশোধন ছিল। 'এখনই করতে হবে'– আমাদের একটা সর্বগ্রাসী চিন্তা হয়ে গেছে। দেশের সমস্যা অবশ্যই আছে, অনেক সমস্যা আছে। এখন আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ভঙ্গুর হয়ে গেছে, শক্তিহীন হয়ে গেছে বলতে হবে। কিন্তু এটাকে আমরা যদি বলি যে, কালকেই একটা ফরমান জারি করে ঠিক করে ফেলবো, তাহলে কিন্তু এই সংবিধানের ইতিহাস থেকে আমাদের কিছুই শেখা হয় নাই। সংসদ হলো আইন প্রণয়নের জন্য আলাপ-আলোচনার জায়গা। আমাদের দুর্ভাগ্য, গত কয়েকটা সংসদে এই আলাপ-আলোচনাগুলোই হয় না এবং আলাপ-আলোচনাগুলো হওয়াটাই হলো দেশের আইনের শাসনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পূর্বশর্ত এবং এই পূর্বশর্তটা যদি আমরা না বুঝি, তাহলে ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা গ্রহণের কথা তা আমাদের হবে না।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নববর্ষ উদযাপন : ১লা বৈশাখ ১৪৩৩

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগারে নতুন সংযোজন

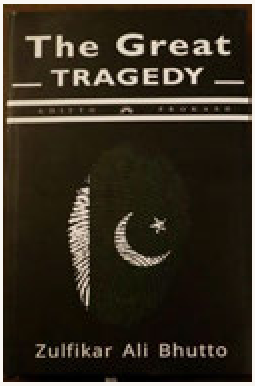

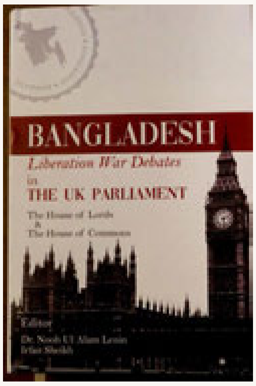

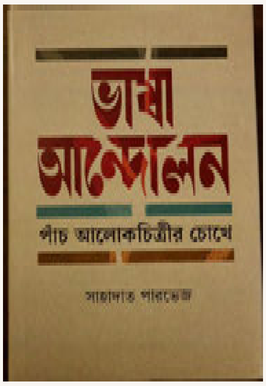

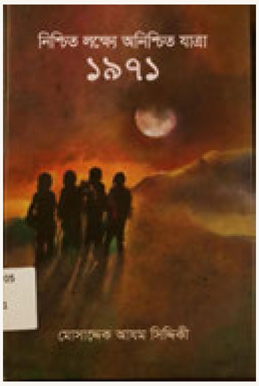

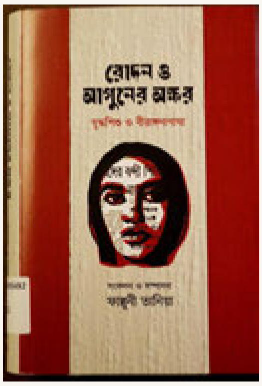

সম্প্রতি গ্রন্থাগারে মুক্তিযুদ্ধকলীন সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানা আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত বই 'Bangladesh : Liberation War Debates in the UK Parliament' এবং স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও রাজনীতি নিয়ে লেখা পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলীর ভুট্টোর 'The Great Tragedy' বই দুটি সম্প্রতি গ্রন্থাগারে নতুন সংযোজিত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা:
'ভাষা আন্দোলন: পাঁচ আলোকচিত্রির চোখে', 'নিশ্চিত লক্ষ্যে অনিশ্চিত যাত্রা ১৯৭১' এবং গল্পগ্রন্থ 'রোদন ও আগুনের অক্ষর' বই ৩টি গ্রন্থাগারে উপহারস্বরূপ যথাক্রমে গ্রন্থগুলোর লেখক সাহাদাত পারভেজ, মোসাদ্দেক আযম সিদ্দিকী এবং সংকলক ফাল্গুনী তানিয়ার কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। সাহাদাত পারভেজ, মোসাদ্দেক আযম সিদ্দিকী এবং ফাল্গুনী তানিয়াকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ অতিথি

খ্যাতমান সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত ও তার পরিবার সম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ভ্রমণকালে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময়ে তার সাথে ছিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী বুলবুল ইসলাম এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

মুক্তিযুদ্ধের করুণ ইতিহাস আমাদেরকে মর্মাহত করেছে। শহিদের সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে নারী জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য শত শহিদকে আমার সালাম।

শায়লা ইয়াসমিন/২১.৫.২০২৬

লক্ষ কোটি শহিদের জীবনের বিনিময়ে পেয়েছি বাংলাদেশ। এই দেশ আমার, আপনার, আমাদের সকলের। প্রতিটা নিদর্শন দেখে মনে হচ্ছে আমি সেই স্বাধীনতার পূর্বে ফিরে গেছি। অনেক ভালো লেগেছে, সুন্দর সময় পার করেছি কিন্তু এই সুন্দর সময় ও দেশের পেছনে যাদের অবদান তাদেরকে জানাই হাজার সালাম।

হাসানুজ্জামান, ঝিনাইদহ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official